গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা ২ জানুয়ারি ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

চা বাগানে মৃত্যুপ্রবাহ

মন্ত্রী নির্বিকার

উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে চলছে মৃত্যুর মিছিল। ঢেকলাপাড়া বাগানে চার সন্তানের জননী ঊষা ছেত্রী খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। এই বাগানে দেড় বছরের মধ্যে শতাধিক শ্রমিক মারা গেছেন। মুজনাই চা বাগানে ইতিমধ্যেই ১১৫ জন শ্রমিক অনাহার, অর্ধাহার এবং অপুষ্টিজনিত কারণে মারা গেছেন। লক আউটের জন্য বন্ধ কাঁঠালগুড়িতে অন্তত ১০০ থেকে ১৫০ জন অনাহারে মারা গেছেন গত একবছরে। আরও অনেকেই মৃত্যুর অপেক্ষায় ধুঁকছেন। রামঝোরা, রহিমাবাদ, রায়মাটাং বাগানগুলিতেও একই অবস্থা। যোগেশ চন্দ্র টি এস্টেটে গত ৭মাসে ৮০ জন শ্রমিক মারা গেছেন। কী করে চলবে, বাঁচব কীভাবে, খাব কী এই প্রশ্ন ডুয়ার্সের বাগানে বাগানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অথচ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মহম্মদ আমিন বাগানে কোন মৃত্যুর খবরই নাকি রাখেন না। পাছে শ্রমিকদের দায় শ্রমমন্ত্রী হিসাবে বহন করতে হয়, তাই সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে মন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, না খেয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর কোনও খবর নেই।

ডুয়ার্সের ২০/২৫টি বাগানে মাসের পর মাস ধরে স্ট্রাইক করে চলেছে বাগানের মালিক, বাগান বন্ধ করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। এই অবস্থায় শ্রমিকরা খাচ্ছে কী ? জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রায়পুর চা বাগানের শ্রমিক বীরসা মুণ্ডা জানালেন, জংলি কচু আর ঢেঁকি শাক খেয়ে শ্রমিকরা দিন অতিবাহিত করছেন। শামুকতলার কাছে রহিমাবাদ চা বাগানের শ্রমিক গাঙ্গি

সাতের পাতায় দেখুন

২৭ ডিসেম্বর বহরমপুরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ। বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। (সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

জয়নগরের ঘটনায়

সিপিএমের পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার

জয়নগর এবং কুলতলিতে এস ইউ সি আই-এর সংগঠন ভাঙবার জন্য সি পি এম-এর ফ্যাসিস্ট চক্রান্ত জয়নগরের ভবানীমারিতে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সমাবেশ ফেরত মহিলাদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। এই ঘটনায় এস ইউ সি আইকে দোষী সাব্যস্ত করে ২৩ ডিসেম্বর 'গণশক্তি' পত্রিকা লেখে ''রবিবার রাতে পাটুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সমাবেশ থেকে বাড়ি ফেরার পথে জয়নগরের ভবানীমারিতে এস ইউ সি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে সর্বস্বান্ত হয়েছেন মহিলারা। তিনটি ট্রেকারের প্রায় ৭৫ জন মহিলার পরনের গহনা ও সঙ্গে থাকা নগদ অর্থ ছিনতাই হয়েছে। কয়েকজনের শ্লীলতাহানিও হয়েছে।'' অন্যান্য দৈনিক সংবাদপত্রেও তাদের দেওয়া এ খবর ফলাও করে ছাপা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যা এই খবর প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট আকারে একবারে ৫ কলাম হেডিং করে ছাপে। সি পি এম এই ঘটনার প্রতিবাদে ২৩ ডিসেম্বর জয়নগর থানা এলাকার বেলেদুর্গানগর এবং মায়াহাউড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সর্বাত্মক বন্‌ধের ডাক দেয়। ঐদিন বিকালে এক সভায় তাদের গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদিকা বলেন, ''উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে মহিলাদের ওপর আক্রমণ করেছে এস ইউ সি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এই আক্রমণ গোটা মহিলা সমাজের ওপর আক্রমণ। মহিলাদের সম্ভ্রমহানি করার মধ্য দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করতে চাইছে এস ইউ সি (গণশক্তি ২৪-১২-০৩)। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় ২৭ ডিসেম্বর প্রতিবাদ সভা করে।

এইভাবে বিশাল আকারে প্রচার করে গোটা পশ্চিমবাংলার জনগণের সামনে এস ইউ সি আইকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে সি পি এম, এবং তার আড়ালে এস ইউ সি আই-এর ওপর হামলা চালানোর চক্রান্ত করে। অনেকেরই স্মরণে আছে, বেশ কয়েকবছর আগে কুলতলির একটি হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে 'ছেলের রক্ত মাকে খাওয়ানো'র গল্প ফেঁদে এবং কাগজে দিনের পর দিন তা প্রচার করে এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে সারা রাজ্য সি পি এম তোলপাড় করে দিয়েছিল। এত কিছু করা সত্ত্বেও সেদিনও দেশের মানুষের মনে তারা

চারের পাতায় দেখুন

জয়নগরে ছিনতাই ও নারীলাঞ্ছনার ঘটনায় সিপিএমের দুষ্কৃতীরাই জড়িত

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রবোধ পুরকাইত

২৯ ডিসেম্বর কলকাতায় এস ইউ সি আই রাজ্য অফিসে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে কুলতলি কেন্দ্রের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত বলেন,

গত ২১ ডিসেম্বর তারিখে জয়নগর থানার অন্তর্গত বারাসত ও কেল্লার মধ্যবর্তী গ্রাম ভবানীমারিতে সি পি এম দুষ্কৃতীদের দ্বারা ট্রেকার ছিনতাইয়ের ঘটনাকে এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে চালিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব নিজেদের দলের সমাজবিরোধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমকেও সি পি এম নেতৃত্ব এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে। কিন্তু পুলিশ ও সাংবাদিকদের তদন্তে একথা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে যে, ঐ ছিনতাই ও নারী লাঞ্ছনার ঘটনায় সি পি এম দুষ্কৃতীরাই জড়িত ছিল। তিন সি পি এম নেতা যথা, বিশ্বনাথ সরদার, ইব্রাহিম সেখ ও হান্নান লস্করকে লুণ্ঠিত মালপত্র ও মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এছাড়া এই ঘটনায় সি পি এম-এর জেলা সম্পাদক ও লোকাল সম্পাদক পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বলেছেন। নিজেদের কুকীর্তি ঢাকতে এস ইউ সি আই-এর ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করতে গিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসে পড়েছে।

১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে এই একই স্থানে আমাদের দলের দুই কর্মী কমরেড গীতা ঘরামি ও জুব্বার খাঁকে জীবনমণ্ডলের হাট থেকে ফেরার পথে সি পি এম ঘাতকরা কুপিয়ে হত্যা করে। ২০০১ সালে ট্রেকার ছিনতাই করতে গিয়ে লুঠ ও গোবিন্দপুর গ্রামের এক যুবককে গুলি করে হত্যা করে। ২০০৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ৭ মে ঐ স্থানেই আমাদের সমর্থক মুদির দোকানের মালিক অভয় মণ্ডলকে সি পি এম দুষ্কৃতীরা গুলি করে হত্যা করে। প্রতিটি ঘটনাই জয়নগর থানা ও মহিষমারী পুলিশ ক্যাম্পে মিছিল ও ডেপুটেশন সহকারে জানানো হয়েছে। আজ পর্যন্ত পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বার বার আমাদের দলের বিধায়করা এই সন্ত্রাস ও

চারের পাতায় দেখুন

মোটর সাইকেলে কর ঃ মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

এ রাজ্যের সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার আর্থিক সংকটের অজুহাতে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের সমস্ত কিছুর উপর বিপুল ট্যাক্স চাপিয়েছে। একইভাবে মোটর সাইকেল, স্কুটার প্রভৃতি কেনার সময় একসঙ্গে ১৫ বছরের ট্যাক্স নিয়েছে, তার উপর 'আজীবন ট্যাক্সে'র নামে গাড়ির হর্স পাওয়ার অনুযায়ী ১৫০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন ট্যাক্স ধার্য করেছে। ৩১.১২.০৩-এর মধ্যে এই ট্যাক্স পরিশোধ না করলে ১০০ শতাংশ ফাইন দিতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ১৮ ডিসেম্বর মোটর সাইকেল মালিকরা সভা করে 'পূর্ব মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট টু হুইলার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে তুলেছেন। এদের পক্ষ থেকে ১৯ ডিসেম্বর দেড়শতাধিক মানুষের মোটর সাইকেলের মিছিল জেলাশাসক ও জেলা পরিবহণ দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়ে রাজ্য সরকারের ট্যাক্স নীতির প্রতিবাদ জানায়। ২৩ ডিসেম্বর এগরায় চার শতাধিক মোটর সাইকেলের মিছিল এস ডি ও অফিসে ডেপুটেশন দিয়ে 'আজীবন কর' নীতির প্রতিবাদ জানায়।

খাজনা সেস ও ট্যাক্সের আক্রমণ রুখতে পুরুলিয়ায় বিক্ষোভ

রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির ক্রমাগত আক্রমণে গ্রামীণ চাষী মজুর, নিম্নবিত্ত জনসাধারণের অর্ধভুক্ত অবস্থাতেও বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাজনা বৃদ্ধি, সেস্ বৃদ্ধি, মকুব হওয়া খাজনা ও সেস্ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ আদায়, চাষের স্তরভেদে খাজনা-সেস্-করবৃদ্ধি, গৃহপালিত পশু-পাখি এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিষের ওপর কর চাপানো, চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া ও জলের দরে বিক্রি করতে বাধ্য করা, ব্যয়ভার বৃদ্ধি করে মানুষকে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, দলবাজী দুর্নীতি ও প্রশাসনিক কঠোরতায় দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী গরিব মানুষের বি-পি-এল কার্ড থেকে বঞ্চিত করা, গ্রামীণ মজুরদের পরিচয়পত্র না দিয়ে খেতমজুরদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, জলকর বসানো, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি করা, ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দিয়ে গরিব সাধারণ মানুষ ও যুবশক্তিকে মাদকাসক্ত করে শোষণ-শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার হীন চক্রান্ত করা প্রভৃতি জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে গ্রামীণ জীবনে এক শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী নয়া কৃষিনীতি, যার সাহায্যে আগামী দিনে কৃষিক্ষেত্র থেকে সাধারণ চাষীদের হটিয়ে দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী একচ্ছত্রভাবে চাষের উপর মালিকানা কায়েম করবে।

২৩ ডিসেম্বর সারা রাজ্য জুড়ে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। পুরুলিয়া জেলায় জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে গরিব চাষী, মজুর ও সাধারণ মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ, এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ। কমরেড সীতারাম মাহাতো এবং কমরেড অনিল বাউরী সহ ৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল ১২ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেলাশাসকের কাছে পেশ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে জেলাব্যাপী খাজনা ও সেস্ বয়কট এবং নতুন মদের দোকান প্রতিরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

চোলাই মদের বিরুদ্ধে নাগপুরে মহিলা বিক্ষোভ

মহারাষ্ট্র বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনটিতে ১৯ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই এবং মহিলা সাংস্কৃতির সংগঠনের নাগপুর কমিটির নেতৃত্বে মহিলারা ব্যানার ফেস্টুনে সুসজ্জিত সুসংগঠিত মিছিল করে বিধানভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। মিছিলের দাবি ছিল বেআইনি চোলাই মদের ঠেকগুলি উচ্ছেদ করতে হবে। হিংগ্না তালুক এলাকার চিচোলি পাথার, মোহগাও জিলপি, নভেগাঁও, কিনহি দানোলি, মন্ডব ঘোরাদ প্রভৃতি গ্রামগুলিতে এমন অসংখ্য মদের ঠেক রয়েছে, যা গ্রামগুলির সুস্থ সামাজিক পরিবেশ নষ্ট করে দিচ্ছে, নানা অসামাজিক ঘটনা ঘটাচ্ছে। মিছিলের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যেসব পুলিশকর্মী এই মদের ঠেকগুলিকে মদত দিয়ে চলতে সাহায্য করছে এবং অসামাজিক মদ ব্যবসায়ীদের আড়াল করছে তাদের শাস্তি দিতে হবে। মিছিলের মহিলাদের ক্রুদ্ধ অভিযোগ ছিল 'এই মদের প্রসার আমাদের পরিবারের ক্ষতি করছে'। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, কংগ্রেস-এন সি পি সরকারের আবগারি দপ্তরের মন্ত্রী অনিল দেশমুখকে এই জমায়েতের সামনে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু কোনও মন্ত্রী বা আমলা মিছিলকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করায় মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং উত্তপ্ত স্লোগানে রাজ্য সরকারকে ধিক্কার জানান। বিক্ষোভকারীরা ঘোষণা করেন কোনও মন্ত্রী বা আমলাকে হিংগ্না তালুকে ঢুকতে দেবেন না।

এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ নন্দিনী ভোন্ডে, লক্ষ্মণ বোরিয়ার, পান্ডুরাং ভুজাদে। এছাড়াও বাবিবল ভোপে, পদ্মকার বোরিওয়ার, বানিগোটে, নানুবাই পুন্ড, আগারকর, মিনা দাখলে, মুক্তাবাই চৌধুরী, সন্ধ্যা নিগোট ও অন্যান্যরা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হল

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র কলকাতা জেলা সম্মেলন

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণসহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রতিটি শিক্ষাস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল এদেশের একমাত্র বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও'র ৮ম কলকাতা জেলা সম্মেলন। ১৮ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার বিদ্যাসাগর মূর্তি সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশে রাজ্য সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান, জেলা কমিটির বিদায়ী সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ ছাত্রনেতারা বক্তব্য রাখেন। প্রধানবক্তা এস ইউ সি আই-এর কলকাতা জেলা কমিটিরসদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য আন্দোলনবিরোধী দক্ষিণপন্থী এবং মেকী বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির মুখোশ খুলে দিয়ে এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান। ১৯ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে আয়োজিত প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনা করেন জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড তমাল নন্দ'র নেতৃত্বে দশ জনের সভাপতিমণ্ডলী। মূল প্রস্তাবসহ মদের লাইসেন্স, ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার, আর জি করের ডাক্তার বরখাস্ত সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করা হয়। পরে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হয়। ডায়মন্ডহারবার ফকির চাঁদ কলেজের অধ্যাপক ব্রহ্মানন্দ ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত হয়ে ছাত্র প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করে বক্তব্য রাখেন। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড সুব্রত গৌড়ী। এরপর রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান শিক্ষাক্ষেত্রে নানান সমস্যার কথা তুলে ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে উপস্থিত প্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানান। কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তীকে সভাপতি ও কমরেড আয়সানুল হককে সম্পাদক করে প্রস্তাবিত ৫০ জনের কমিটি ও ৫২ জনের কাউন্সিল প্রতিনিধিদের সহর্ষ করতালিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

ভূটানে সামরিক অভিযান প্রসঙ্গে আসাম রাজ্য কমিটির বিবৃতি

গত ১৫ ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ ভূটানে রয়াল ভূটান আর্মি যে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, যার ফলে বহু মূল্যবান প্রাণ চলে গেছে, মহিলা ও শিশুদের নিদারুণ কষ্ট ও অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে, বিশেষ করে মহিলাদের মর্যাদা লাঞ্ছিত হওয়ার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এস ইউ সি আই-এর আসাম রাজ্য কমিটি। ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে রাজ্য কমিটি ভূটান সরকার ও ভারত সরকার উভয়ের কাছেই অবিলম্বে সামরিক অভিযান বন্ধ করার জন্য এবং আলফা এবং অন্যান্যরা ভূটানে শিবির স্থাপন করার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসায় পৌঁছানোর আন্তরিক প্রয়াস চালানোর জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে। নারী ও শিশুদের পূর্ণ নিরাপত্তার দাবিও তোলা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনায় সম্মতি হওয়ার জন্য ও যেসব ইস্যু তারা তুলেছে সেগুলি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার জন্য আলফা নেতৃত্বের প্রতিও রাজ্য কমিটি আহ্বান জানিয়েছে।

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনে প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন

‘‘বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর কিছু অংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে’’

২০ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে চারটায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে দু'দিনব্যাপী সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী শ্যামল কুমার সেন।

বিরাট শতবার্ষিকী হলে উপচে পড়া ভিড় দেখে বিস্মিত বিচারপতি সেন বলেন, এত বড় সমাবেশের কথা আমি ভাবতে পারিনি। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এত বড় সংগঠন গড়ে উঠেছে দেখে আমি বিস্মিত। আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার মনে হয় আপনারাই ভারতবর্ষের মধ্যে বৃহত্তম গ্রাহক সংগঠন। তিনি বলেন, কলকাতায় বিদ্যুৎ পরিষেবার কিছু উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রাম বাংলার অবস্থা খুব খারাপ। একবার বিদ্যুৎ গেলে ফিরে আসতে ২/৩ দিন। এই অবস্থার উন্নতি হওয়া দরকার। প্রচলিত সব আইন বাতিল করে যে নতুন আইন করা হয়েছে তার ফলে ৪৮ শতাংশ দাম বাড়তে পারে। অভিন্ন মাশুলের ফলে গরিব-মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিতে অনেকটা দাম বেড়ে যাবে। শ্রী শ্যামল সেন বলেন, এ বিষয় নিয়ে আপনারা প্রথমে আলোচনা করুন। আলোচনায় কাজ না হলে আন্দোলন করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্বায়নের ফলেই এ'সব হচ্ছে। বিশ্বায়নের সবকিছুই আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। বিশ্বায়নের ক্ষতিকারক দিকটা বাদ দিতে হবে। বর্তমান বিদ্যুৎ আইনের ফলে রাজ্যে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প ধাক্কা খাবে, আরো সংকটে পড়ে যাবে। তিনি বলেন, শুধু বিদ্যুৎ নয়, স্বাস্থ্য পরিষেবাও একটা জরুরি পরিষেবা। তার উপর যেভাবে চাপ বাড়ছে, ঔষধের দাম যেভাবে বাড়ছে তা নিয়েও আন্দোলন করা দরকার। সবদিক বিচার করে বলা যায় যে, বর্তমান বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর কিছু কিছু অংশ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে।

সম্মেলনের আমন্ত্রিত অতিথি কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শ্রী কমল বসু এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় লিখিত বক্তব্য পাঠান। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ লিখিত বক্তব্যে বলেন, ‘‘শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমি বিদ্যুৎগ্রাহকদের জন্য বর্তমানে অতি প্রয়োজনীয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারলাম না। এজন্য দুঃখিত। একালের জনজীবন এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষ্ঠু বিদ্যুৎনীতি মেনে না চললে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটবে বলে আমি আশঙ্কা করি। উত্তরোত্তর বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই জনসাধারণ বিপন্ন বোধ করছেন, তাই এক্ষেত্রে হঠকারী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের পক্ষে অনভিপ্রেত। মনে রাখা দরকার, বিদ্যুতের সরবরাহ এবং মূল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের অসংখ্য বেকারেরও ভবিষ্যত। আবার অন্যদিকে ভ্রান্ত বিদ্যুৎনীতির ফলে অসংখ্য মানুষের কর্মহীন হয়ে পড়ারও আশঙ্কা আছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইনের ভ্রান্তি রাজ্যস্তরে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আমার একান্ত বাসনা, দেশের শাসকবৃন্দ বিদ্যুৎগ্রাহকদের সমস্যার প্রতি মনোযোগ দিয়ে অর্থনৈতিক সংকটমোচনে ব্রতী হবেন।

(উপরে) ২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে বসে আছেন (বাঁদিক থেকে) ভবেশ গাঙ্গুলি, শ্যামল কুমার সেন, সঞ্জিত বিশ্বাস ও সুজয় বসু। (নিচে) ২১ ডিসেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলনের একাংশ

প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন মেয়র শ্রী কমল বসু লিখিত বক্তব্যে বলেন, বর্তমান যুগে উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। বিতর্ক চলছে মাশুল আর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। আমি মনে করি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়লে যেকোন সময়ে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের শ্রেণী ভাগ করে ব্যবহারের গুরুত্বের মূল্যায়ন করে মাশুল ঠিক করা যেতে পারে — যেমন গৃহস্থ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, জল সরবরাহ, ক্ষুদ্র শিল্প, সামাজিক কাজকর্ম ইত্যাদি। এছাড়া বৃহৎ কনজিউমার এবং সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে প্রভেদ রাখতে হবে।

বিশিষ্ট বিদ্যুৎ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সুজয় বসু বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করার চেষ্টা চলছিল। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর মধ্য দিয়ে এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছে। আমি বহু বছর বিদ্যুতের বিষয় নিয়ে কাজ করছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই নীতি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকারক। আমাদের দেশে এই নীতি এখনই কার্যকর করা উচিত নয়। এ সব করা হচ্ছে বিশ্বায়নের, উদারীকরণের ফলে।

এই নীতির ফলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে। মাশুল অনেক গুণ বেড়ে যাবে। কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, গরিব মানুষ আরো সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বলা হচ্ছে, প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হবে, প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমে যাবে। এসব ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের কোর্টে যাবার অধিকার থাকছে না — এটাই ঘটতে চলেছে। কমিশন কখনই কোর্টের বিকল্প হতে পারে না। হওয়াও উচিত নয়। তাহলে গণতন্ত্রের বিপদ ঘটতে পারে। আমাদের সবাইকে যে কথাটা ভাল করে ভাবতে হবে, তা হল, কোন্ বিশেষ প্রয়োজন থেকে পুরনো সব আইন বাতিল করে দিয়ে এই নূতন আইন চালু করা হল। তা জনস্বার্থের সাথে কতটা যুক্ত?

সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বর্তমান আইনে প্রতিযোগিতার নামে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিযোগিতার নাম করে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোকে কর্মী ছাঁটাইয়ের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, যতটা সর্বনাশের কথা আলোচনা হচ্ছে, সর্বনাশ তার থেকেও বেশি হতে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার উভয়ে মিলে বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বার্থে এই ষড়যন্ত্র করছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধূর্ততার যে কৌশল গ্রহণ করেছে, তিনি তার মুখোস খুলে দেবার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের সামনে সময় কম। এখন থেকেই সংগঠিত হতে না পারলে আক্রমণ নেমে এলে প্রতিরোধ করা যাবে না। ফলে এখন থেকেই সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলি বক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, যে সব বুদ্ধিজীবী বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁদের এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি আবেদন জানান। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে অজয় চ্যাটার্জীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ।

২১ ডিসেম্বর বেলা ১০টায় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৯০৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে শুরু হয় প্রতিনিধি সম্মেলন। ভবেশ গাঙ্গুলি, সদানন্দ বাগল, নারায়ণ চন্দ্র দাস, সমীর গুহ নিয়োগী, মঙ্গল পুরকায়স্থ, কমল লাহিড়ি, মহাদেব কোলেকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সদানন্দ বাগল বলেন, যেহেতু গতকালের প্রকাশ্য সমাবেশেই কুণাল বিশ্বাস মূল প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং শিবাজী দে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন, আপনারা ইতিমধ্যেই সেই প্রস্তাবের কপি পেয়ে গিয়েছেন, তাই নূতন করে প্রস্তাবটি পেশ করা হচ্ছে না। মূল প্রস্তাবের উপর তিনি সবাইকে আলোচনায় অংশ নিতে আহ্বান করেন। সাধারণ সম্পাদকের পক্ষ থেকে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন অমল মাইতি। কোষাধ্যক্ষের পক্ষ থেকে অডিট রিপোর্টটি পেশ করেন অনুকূল ভদ্র।

বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নিয়ে নতুন নতুন প্রস্তাব পেশ করেন।

সম্মেলনে গৃহীত মূল প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘বিদ্যুৎ হল একটি অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবা এবং বর্তমান যুগের উন্নয়নের মাধ্যম। স্বাধীনতার ৫৬ বছর পরেও পশ্চিমবঙ্গের ৫০ শতাংশ মানুষ এই জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। এর প্রধান কারণ হল রাজ্যের ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অথবা নিম্নবিত্ত। কৃষিনির্ভর পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় অন্ধ্রের তুলনায় এক-দশমাংশ। কিন্তু সব রাজ্যে যখন কৃষিতে বিদ্যুতের দাম ৫০ পয়সা প্রতি ইউনিট, তখন পশ্চিমবঙ্গে ১৩৮ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাশুল সব থেকে বেশি হওয়া সত্ত্বেও লোডশেডিং, লো ভোল্টেজ, গ্রাহক হেনস্থা নিত্যদিনের ঘটনা। সি ই এস সি বেসরকারি সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কিছু হেরফের নেই।

১৯৯১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গেও বিদ্যুৎ শিল্পে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে একদিকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে পঙ্গু করে দেওয়া এবং কোম্পানিতে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে, অপরদিকে নগ্নভাবে সি ই এস সি-কে অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে। বর্তমান বছরেই সি ই এস সি-কে ২০৪.৬৯ কোটি টাকা ছাড় দেওয়া, বকেয়া প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা আদায় না করা এবং উৎপাদন খরচের থেকে কম দামে সি ই এস সি-কে বিদ্যুৎ বিক্রি করে অতিরিক্ত ১৬২ কোটি টাকা পর্ষদের লোকসান বাড়িয়ে দেওয়া উপরোক্ত বক্তব্যকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ‘বিদ্যুৎ আইন

ছয়ের পাতায় দেখুন

‘অ্যাবেকা’র শোক জ্ঞাপন

২১ ডিসেম্বর '০৩ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ১০ম রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন চলাকালীন মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার প্রতিনিধি আবদুল খালেক হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি স্নান করতে গেলে দীর্ঘক্ষণ কোনও সাড়া না পাওয়ায় স্নানঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে বের করে সঙ্গে সঙ্গে সল্টলেকের ‘ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল’-এ নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই দুঃখজনক ঘটনায় সম্মেলন স্থলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ১ মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শোক প্রকাশ করেন।

সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এক বিবৃতিতে প্রয়াত আবদুল খালেকের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এস ইউ সি আই-কে জড়িয়ে পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচার

একের পাতার পর

এস ইউ সি আই সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। সেদিন এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে সি পি এম-এর প্রচারের সত্যতা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়াত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্তের নেতৃত্বে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হয়েছিল। সেই প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয় লোকের সাথে কথা বলে সি পি এম-এর প্রচার যে মিথ্যা সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে তার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন। এবারেও ঘটনা ঘটার পরেই ২৩ ডিসেম্বর আমাদের দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গোপাল বসু, বিধায়ক ও জেলার জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে থানায় গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই এলাকায় দীর্ঘদিন থেকেই সি পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দ্বারা প্রায়শই যে চুরি, ছিনতাই হয় সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বারবার থানায় যে জানিয়েছি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছি তার উল্লেখ করে দলীয় নেতৃত্ব পুলিশ-প্রশাসনের কাছে এবারও তাদেরকেই দায়ী করে সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করেন যে, (১) অবিলম্বে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে, (২) দোষী সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, (৩) এলাকার মানুষের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

অতীতে নানা অপপ্রচার করা সত্ত্বেও এস ইউ সি আই সম্পর্কে দেশের মানুষের মনে তারা যেমন কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারেনি, এবারেও তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এস ইউ সি আই সম্পর্কে তাদের অভিযোগ কেউ বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে করেনি। এমনকি সি পি এম-এর এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় সাধারণ মানুষই সোচ্চার হন এবং সি পি এমকে ধিক্কার জানাতে থাকেন। অবশেষে ২৫ ডিসেম্বর সংবাদ প্রতিদিন-এর সান্ধ্য সংখ্যায় প্রকাশিত এক খবরে প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হয়। তাতে লেখা হয় ''বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সভা থেকে ফেরা সি পি এমের মহিলা কর্মীদের নিগ্রহের পিছনে দলেরই এক নেতা জড়িত বলে প্রমাণ মিলল। বুধবার রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে সি পি এম নেতা হান্নান লস্কর সহ আরও তিনজনকে গ্রেফতার করে। ফলে এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল। জয়নগরের বেলেদুর্গানগরের ঘটনায় সি পি এমের কর্মীরা যুক্ত বলে এস ইউ সি'র তোলা অভিযোগই প্রতিষ্ঠিত হল। পুলিশ ধৃত তিনজনের কাছ থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছে। ওই দিনের ঘটনায় সি পি এমের মহিলা কর্মীদের লুঠ হওয়া চাদর, ব্যাগ, রূপা, সোনার গহনা ও কিছু টাকা ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।'' ফলে জয়নগরের ঘটনাও যে, অতীতের মতই এস ইউ সি আই-এর বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত এবং প্রথম থেকেই এস ইউ সি আই নেতৃত্ব এই ঘটনা সি পি এম আশ্রিত সমাজবিরোধীদের কাজ বলে যে কথা বলে আসছিল তাকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতি-ষ্ঠিত করল।

'এস ইউ সি আশ্রিত সমাজ-বিরোধী' বলে সি পি এম নেতারা প্রায়শই মানুষকে বিভ্রান্ত করার যত চেষ্টাই করুন না কেন, দেশের মানুষ সহজ বুদ্ধিতেই জানে সমাজবিরোধীরা সবসময়ই শাসক দল বা শাসন ক্ষমতায় যেতে পারে তেমন সমস্ত দলের আশ্রয়েই থাকে। কারণ, সেখানেই তারা নিরাপদ। তাদের আশ্রয়ে থেকে নির্ভয়ে সমস্ত অপকর্ম তারা চালাতে পারে, বিনিময়ে নির্বাচনে ভয়-ভীতি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, রিগিং করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে এবং নির্বিচারে খুন-জখম-হামলা চালিয়ে বিরুদ্ধ দলের সংগঠন ভাঙতে শাসক দল তাদের কাজে লাগায় এবং বিশ্বস্তভাবে তারা সেটা পালন করে।

২৩ ডিসেম্বর জয়নগর থানায় বিক্ষোভ

একদিকে মালিক তোষণ, অন্যদিকে বিরোধী শক্তিকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ধ্বংস করাই হচ্ছে সিপিএমের বর্তমান রাজনীতি। দুলাল ব্যানার্জী, বুল্টা, তারকেশ্বর লোহার — সবই সিপিএমের এই রাজনীতিরই ফসল। এস ইউ সি আই-এর সংগঠন ভাঙবার জন্য এবং জয়নগর কুলতলিতে এস ইউ সি আইকে ভোটে হারাবার জন্য সিপিএম দীর্ঘদিন ধরে এই ফ্যাসিস্ট রাজনীতি চালিয়ে আসছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তা না করতে পেরে বর্তমানে সিপিএমের এব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে সেখানকার সমস্ত সমাজবিরোধীদের জড় করে আরও ব্যাপকহারে তারা একের পর এক চক্রান্ত ও ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। সিপিএমের হাতে এস ইউ সি আই-এর স্থানীয় শতাধিক নেতা-কর্মী-সংগঠক খুন হয়েছে। এমনকি আমাদের কৃষক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক তেভাগা আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় কমরেড আমির আলি হালদারকে খুন করতেও তাদের আটকায়নি। যারা খুন করেছে তাদের নির্দিষ্ট নাম দিয়ে বারবার অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও তাদের ধরা হয়নি। অথচ বহু এস ইউ সি আই কর্মী ও নেতৃস্থানীয় সংগঠককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে তারা জেলে পাঠিয়েছে যাদের আজও মুক্তি হয়নি। বহু এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থককে তারা নিরাশ্রয় করেছে, বহু পরিবারকে সর্বস্বান্ত করেছে। এই ফ্যাসিস্ট রাজনীতির পথেই জয়নগর-কুলতলিতে এস ইউ সি আই-এর সংগঠন সিপিএম ভাঙতে চাইছে। জয়নগরের সাম্প্রতিক ঘটনাও সেই ফ্যাসিস্ট চক্রান্তেরই অঙ্গ।

প্রতিদিন

মহিলা নিগ্রহে ধৃত সিপিএম নেতা

সিপিএম দুষ্কৃতীরাই জড়িত

একের পাতার পর

সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু সরকারি তরফে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। স্থানীয় সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর মদতেই যেহেতু সমাজবিরোধীরা এই কার্যকলাপ চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে পুলিশও কোন ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। সি পি এম দল, পুলিশ ও সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীর নেতৃত্বে জয়নগর-কুলতলিতে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এই সমাজবিরোধীদের হাত থেকে সি পি এম সমর্থকরাও রক্ষা পাচ্ছেনা। এদের হাতে নারীদের ইজ্জতও আজ বিপন্ন। গত ২১ ডিসেম্বরের ঘটনায় সি পি এম দুষ্কৃতীদের হাতে তাদেরই দলের মহিলা সমিতির সদস্যাদের লাঞ্ছনা এই সত্যই প্রমাণ করেছে।

আমরা জয়নগর-কুলতলি তথা সারা রাজ্যের মানুষের কাছে সি পি এম-এর সন্ত্রাসের রাজনীতি প্রতিরোধে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। অবিলম্বে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ না হলে আগামী জানুয়ারি মাস থেকে জেলা জুড়ে মিছিল, মিটিং, অবরোধ, থানা ঘেরাও এর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

মদের ঢালাও লাইসেন্স

ডি ওয়াই ও'র বিক্ষোভ মিছিল

'সর্বনাশ করে দেবে মশাই, শেষ করে দেবে রাজ্যটাকে' বলেই খস খস করে নিজের নামটা স্বাক্ষর করলেন সোনারপুর স্টেশনে প্রবীণ একজন মানুষ। 'মদের বিরুদ্ধে সই করাচ্ছেন, নিশ্চয় করবো' — দ্রুত এগিয়ে এলেন একজন শ্রমজীবী মহিলা। রাজ্যে মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে এ আই ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে, তাতে এভাবেই মানুষ এগিয়ে আসছেন। রাজ্যের সর্বত্রই হাজার হাজার মানুষ স্বাক্ষর দিচ্ছেন। বলছেন, ''আপনারা এর বিরুদ্ধে একটা কিছু করুন''। সর্বত্রই মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছেন 'বামফ্রন্ট' নেতাদের।

যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী যে লাগাতার আন্দোলনের সূচনা করেছে, গত ৩ ডিসেম্বর প্রতিবাদ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় ২৬ ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার থেকে এসপ্ল্যানেড অবধি এক যুব বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল। পাঁচ শতাধিক যুবক-যুবতীর এক সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল মদের ঢালাও লাইসেন্সের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে দিতে এসপ্ল্যানেডে পৌঁছায়। সেখানে এক মদের বোতলের কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগে করেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড রূপম চৌধুরী। এক সংক্ষিপ্ত সভায় তিনি বলেন, নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তী-কালে বামপন্থী আন্দোলনকে ভিত্তি করে এ রাজ্যে জনমানসে যে সমাজমুখী মানসিকতা ও রুচি-সংস্কৃতির মানটি গড়ে উঠেছিল,সি পি এমের মতো পার্লামেন্টারি দলগুলির ক্ষমতালোভী ও সুবিধাবাদী রাজনীতির ধাক্কায় তা প্রতিদিন ধ্বসে পড়ছে। তিনি বলেন, ফ্রন্ট সরকারের এই চূড়ান্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহারে বাধ্য করতে হলে আজ যুব সমাজকে ঐক্য-বদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

শ্রমিক আন্দোলনে উত্তাল দক্ষিণ কোরিয়া

ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি জোট সরকার এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, তারাও চায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ হোক। মালিকশ্রেণীর দল হিসাবে তাদের এই আচরণই হওয়ার কথা। আর পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম সরকারও জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে দু'বেলা তোপ দেগে চলেছে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে জরুরি পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করে এবং আরও কিছু শিল্পক্ষেত্রকে 'স্পেশাল ইকনমিক জোনে'র আওতায় এনে সেগুলিতে আন্দোলন-ধর্মঘট বন্ধ করার জন্য এই সরকার আইন করেছে। কারণ, ওঁরা মনে করছেন, আন্দোলন-ধর্মঘট হলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা নাকি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এরই পাশাপাশি আমাদের এশিয়া মহাদেশেরই একটি দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে তাকালে দেখা যাবে, এমন একটি দিন যায় না যেদিন সেখানে শ্রমিক ধর্মঘট হয় না। আন্দোলন-ধর্মঘটের জন্য সে দেশ থেকে বিনিয়োগকারীরা পালিয়ে গেছে — এ'রকম খবর অবশ্য সংবাদপত্রে দেখা যায়নি।

দক্ষিণ কোরিয়ার তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, অন্য বছরগুলির তুলনায় এ বছর সে দেশে আন্দোলন-ধর্মঘট বেশি হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের ওপর সংকটের বোঝা যত চেপেছে শ্রমিক-কর্মচারীরা ততই আন্দোলন-ধর্মঘটে নেমেছে। সংখ্যাবৃদ্ধির পাশাপাশি আন্দোলন-ধর্মঘটগুলি দীর্ঘস্থায়ীও হয়েছে। আন্দোলন-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে সফলতার ভাগ হচ্ছে প্রায় ৯০ শতাংশ। আন্দোলনের সাহায্যে বেতন বাড়ানোর ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিকরা জাপান ও আমেরিকার শ্রমিকদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। সাম্প্রতিক কালে এই তিন দেশে কী পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে তার একটা পরিসংখ্যান দেওয়া হল —

২০০১

দেশ	বেতন বৃদ্ধির শতাংশ
দক্ষিণ কোরিয়া	৮.৬ শতাংশ
জাপান	১.৯ শতাংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩.২ শতাংশ

২০০২

দক্ষিণ কোরিয়া	৬.৩ শতাংশ
জাপান	০ শতাংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১ শতাংশ

২০০৩

দক্ষিণ কোরিয়া	১২ শতাংশ
জাপান	১.৩ শতাংশ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩.৬ শতাংশ

(সূত্রঃ দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রক, সাপ্তাহিক টাইম, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

দক্ষিণ কোরিয়ার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট

এপ্রিল মাসে সামসুং-এর শ্রমিকরা তিরিশ হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে নামে। এ ধর্মঘট ৮৫ দিন ধরে চলার পরে, কোনও শ্রমিককে ছাঁটাই করা হবে না — কর্তৃপক্ষ এই লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বেতনবৃদ্ধির দাবিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহত্তম মোটর নির্মাণকারী সংস্থা হুন্ডাই কোম্পানির ১০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে ৮৭০০ শ্রমিক ধর্মঘটে নামে। এ ধর্মঘট ৪৭ দিন চলে। ৮.৬ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি ও সপ্তাহে ৬ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন কাজের সময় নির্দিষ্ট হওয়ায় ধর্মঘট শেষ হয়।

মে মাসের শেষে দিকে হুন্ডাই মোটর কোম্পানির সহযোগী সংস্থা কিয়া মোটর কোম্পানির ২৩,৫০০ শ্রমিক বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘটে নামে। ২০ দিন ধরে চলার পর ৮.৮ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি মেনে নেওয়ার পরই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়।

জুন মাসে বেসরকারীকরণের বিরোধিতা করে রেল শ্রমিকরা ধর্মঘটে নামে। ১০ দিন ধর্মঘট চলার পর সে দেশের প্রেসিডেন্ট রো উনের পক্ষ থেকে রেলকে বেসরকারীকরণ করা হবে না — এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে।

আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বহুজাতিক নেসলে কোম্পানির ১০ হাজার কর্মচারী প্রস্তাবিত কর্মী ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে নামে। এ ধর্মঘট দু-সপ্তাহ স্থায়ী হয়েছে।

(সাপ্তাহিক টাইম, ৮-৯-২০০৩)

অন্য এক আমেরিকা

সানফ্রান্সিসকো শহরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা হচ্ছে ৮ লক্ষ। রাস্তায় রাত কাটায় ৭৫ হাজার মানুষ। গরিব জনসাধারণের ৩৫ শতাংশের মাসিক আয় ৩৯৫ ডলার, অবশিষ্টাংশের ৫৯ ডলার। সেন্ট অ্যান্টনি ফাউন্ডেশান নামে একটি দাতব্য সংস্থা থেকে যারা খাবার সংগ্রহ করে তাদের সংখ্যা ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (দি ইকনমিস্ট (লন্ডন) ৬-১২-২০০৩)

জাপানে একই হাল

সংখ্যাগরিষ্ঠ জাপানি পরিবারের বার্ষিক আয় ২.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে এখন ৩,৮০০ ডলার। দেশে বেকারির হার ৫.৬ শতাংশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেদেশে এটাই হল বেকারির সর্বোচ্চ হার।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে জাপানি শিল্প সংস্থাগুলি ১৮ লক্ষ চাকরির পদ বিলোপ করেছে, ১২ লক্ষ মানুষ ছাঁটাই হয়েছে।

জাপানি ব্যাঙ্কগুলিতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ হল ৩৮৫ বিলিয়ন ডলার। অনাদায়ী ঋণের দায়ে জাপানের ৫টি বৃহৎ ব্যাঙ্কিং সংস্থা ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। ছোট, বড়, মাঝারি মিলে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া শিল্প সংস্থার সংখ্যা ২৫ হাজার। (সাপ্তাহিক টাইম, ২২-৯-২০০৩)

ব্রিটেনেও খেটেখাওয়া মানুষের অবস্থা একইরকম

গত এক বছরে ব্রিটেনে খেটেখাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার খরচ তুলনামূলকভাবে বেড়েছে ৩ শতাংশ, অথচ মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছে মাত্র ২.৪ শতাংশ।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, পরিষেবা (service) ক্ষেত্রে গত এক বছরে বেতন বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৮ শতাংশ। গত দু-দশকে এটাই হল বেতন বৃদ্ধির সর্বনিম্ন হার।

(নিউজ উইক, ২৯-৯-২০০৩)

বিশ্বায়নের ধাক্কায় সারা বিশ্বে হাজার হাজার চাকরির পদ বিলুপ্ত

১৯৯৫ সাল থেকে ২০০২ সালের মধ্যে বিশ্বের ১৭টি শিল্পোন্নত দেশের কলকারখানায় ১৫ লক্ষ চাকরির পদ বিলোপ করা হয়েছে।

(সাপ্তাহিক টাইম, ২৭ অক্টোবর, ২০০৩)

ইরাক ঃ প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছেই

১৪ ডিসেম্বর ২০০৩ ঃ বাগদাদের ৮০ কিমি পশ্চিমে থালিদিয়া অঞ্চলে একটি থানার সামনে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটানো হলে ১৭ জন নিহত ও ৩৩ জন গুরুতর আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হচ্ছেন মার্কিনীদের গড়া ইরাকি পুলিশবাহিনীর কর্মী।

রাস্তার ধারে পড়ে থাকা একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গেলে একজন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বাগদাদ শহরের ৪০ কিমি দক্ষিণে আল-হাসওয়াতে। (এ পি, দি হিন্দু, ১৫-১২-০৩)

১৫ ডিসেম্বর ঃ বাগদাদের ১০০ কিমি উত্তরে সামারাতে গেরিলারা একটি সেনা কনভয়ের উপর আক্রমণ চালালে মার্কিন সেনাদের সাথে তুমুল সংঘর্ষ হয়।

১৬ ডিসেম্বর ঃ তিকরিত শহরে রাস্তার পাশে রাখা একটি বোমা ফেটে ৩ জন মার্কিন সেনা মারা গেছে। মসুল শহরে রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বোমার আঘাতে দু'জন মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। (এ পি, দি স্টেট্‌সম্যান, ১৭-১২-০৩)

১৮ ডিসেম্বর ঃ রাতে গেরিলাদের আক্রমণে দু'জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে।

অপর একটি ঘটনায় একটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারের উপর গেরিলা আক্রমণে ঘটনাস্থলেই ১৭ জন মারা যায়।

মধ্য বাগদাদে গেরিলাদের আক্রমণে ৩ জন মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়। (পি টি আই, দি হিন্দু, ১৯-১২-০৩)

১৯ ডিসেম্বর ঃ বাগদাদের শহরতলিতে আবু ঘারেইব জেলখানার সামনে সশস্ত্র ইরাকি গেরিলাদের আক্রমণে সেনা কনভয়ের ২ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ৩০ জন যুবক অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে এই আক্রমণে অংশ নিয়েছিল। (এ পি, দি হিন্দু, ২১-১২-০৩)

২০ ডিসেম্বর ঃ রকেট চালিত গ্রেনেডের সাহায্যে গেরিলারা দক্ষিণ বাগদাদে তেলের মজুত ভাণ্ডারে আক্রমণ চালালে ২.৬ মিলিয়ন মজুত গ্যাসোলিন নষ্ট হয়েছে।

বাগদাদের ২৫ কিমি উত্তরে সামহাদাতে গেরিলারা একটি তেলের পাইপ লাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত করায় তেলের সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়েছে।

বাগদাদের ১২০ কিমি উত্তরে সামারাতেও গেরিলারা বিস্ফোরণের সাহায্যে তেলের পাইপ লাইনের উপর আঘাত হানে। পাইপ লাইনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তেলবাহী ৩টি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। (এ পি, দি স্টেট্‌সম্যান, ২২-১২-০৩)

২৪ ডিসেম্বর ঃ কুর্দ অধ্যুষিত শহর আরবিলে এক আত্মঘাতী মানব বোমা বিস্ফোরণে একটি সেনাবাহী ট্রাক উড়ে যায়। আহত হয়েছে ১৫ জন মার্কিন সেনা। রাস্তার ধারে রাখা একটি বোমা ফেটে বাগদাদে ৩ মার্কিন সেনার মৃত্যু হয়েছে।

বাগদাদের উত্তরে সামারা শহরে একটি সেনাবাহী ট্রাকের উপর বোমা ছোঁড়া হলে ৩ জন মার্কিন সেনা মারা গেছে। আরবি ভাষী টিভি চ্যানেল আল জাজিরা জানিয়েছে, সারা দিনে বাগদাদে ৩০টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। টিভি চ্যানেলটি আরও জানিয়েছে, সাদ্দাম হুসেন ধরা পড়ার পর থেকে ইরাকে গেরিলা আক্রমণ তীব্রতর আকার নিয়েছে। (এ পি, আজকাল, ২৫-১২-০৩)

২৫ ডিসেম্বর ঃ মার্কিন প্রশাসনের সদর দপ্তর এবং আরও কয়েকটি বিদেশি আবাসন চত্বর ও হোটেলে গেরিলারা এক ডজনেরও বেশি মর্টার ও রকেট হামলা চালায়। হতাহতের সংখ্যা জানা যায়নি। অপর একটি ঘটনায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা বোমা ফেটে বাগদাদে এক মার্কিন সেনা মারা গেছে। আজ বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে শেরাটন হোটেলে রকেট হামলা চালায় গেরিলারা। এই হোটেল সিআইএ'র দপ্তর হিসাবে কাজ করছে বলে ইরাকিদের সন্দেহ। বাগদাদে ইরান ও তুরস্কের দূতাবাসেও গেরিলারা রকেট হামলা চালিয়েছে। জার্মান দূতাবাসের কাছেই একটি আবাসন চত্বরেও গেরিলারা আক্রমণ চালিয়েছে। (রয়টার্স, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬-১২-০৩)

২৬ ডিসেম্বর ঃ গেরিলাদের মর্টার হানায় বাগদাদের উত্তরে ২ জন মার্কিন সেনা মারা গেছে।

অপর এক আক্রমণের ঘটনায় ২ জন পোলিশ সেনা আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদাদের দক্ষিণ শহরতলিতে। (রয়টার্স, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭-১২-০৩)

লিফলেটস্

আগামী দিনগুলিতে আরও বড় গেরিলা হানার আশঙ্কা করছে মার্কিন সেনারা। কারণ, ইরাকি গেরিলাদের বিলি করা কিছু লিফলেট পাওয়া গেছে, যাতে ইরাকি নাগরিকদের বাড়ির বাইরে আসতে নিষেধ করা হয়েছে, মার্কিন সেনাদের অবিলম্বে ইরাক ত্যাগ করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে এবং বিদেশি শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে কাজ না করার জন্য ইরাকি পুলিশকর্মীদের কাছে আবেদন করা হয়েছে। (দি হিন্দু, ২৬-১২-০৩)

গণতন্ত্রী আমেরিকায় মজুরি বৈষম্য

পূর্ব ইউরোপ, মধ্য আমেরিকা এবং এশিয়া থেকে যারা চাকরির সন্ধানে আমেরিকায় আসে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটাই 'অবৈধ অভিবাসী' হিসাবে চিহ্নিত। আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় দৈনিক মাত্র ২ ডলার মজুরির বিনিময়ে এদের নিয়োগ করা হয়। আজকের আমেরিকায় মোট শিল্প শ্রমিকদের ৬০ শতাংশই হচ্ছে এই অভিবাসী শ্রমিক।

মার্কিন প্রশাসনের ব্যুরো অব্ লেবার স্ট্যাটিসটিকস্ এ তথ্য জানিয়েছে।

(সাপ্তাহিক টাইম, ৩-১১-২০০৩)

রিলায়েন্সকে আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিল গুজরাট সরকার

সংবাদে প্রকাশ, দেশের জনগণের পকেট কেটে গুজরাট সরকার একচেটিয়া রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীকে বিপুল আর্থিক সুবিধা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও রিলায়েন্স গোষ্ঠীর পকেট ভরাতে ৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছে।

কিছুদিন আগে রিলায়েন্স শিল্পসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধীরুভাই আম্বানির মৃত্যুর পর তাঁকে যুগন্ধর পুরুষ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। এক পুরুষের ব্যবসায় ৬০ হাজার কোটি টাকার মালিক হওয়ার পিছনে কত বড় প্রতিভা কাজ করেছে তা ফলাও করে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু গরিব থেকে দেশের শীর্ষ ধনীতে পরিণত হওয়ার পিছনে কতখানি সরকারি মদত আর কতখানি দাগাবাজির ইতিহাস লুকিয়ে আছে, প্রকাশিত সংবাদ তারই আভাস দেয়।

গুজরাট রাজ্যটি ইদানীং শিল্পায়নের দৃষ্টান্ত হিসাবে বহুল প্রচারিত। আম্বানির নামটিও শিল্পায়নের প্রতীকে পরিণত করা হয়েছে। দুয়ে মিলে হয়েছে নরক গুলজার।

১৯৯৯ সালে রিলায়েন্স তার বিশাল তৈল শোধনাগারে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টন উৎপাদন শুরু করে। বর্তমানে তা ৩ কোটি ১০ লক্ষ টন। এই বিশাল পরিমাণ পেট্রোপণ্য বিক্রির বাজার রিলায়েন্স বিদেশে পেতে পারত ; অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং স্বল্প উৎপাদন খরচের জোরে বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা রিলায়েন্স করতে পারত, কিন্তু তারা দেশের বাজারে নজর দিল, কারণ এখানে মুনাফা বেশি।

কেন বেশি ? কারণ আমদানি করা পেট্রোপণ্যে ভালরকম কর থাকায় ভারতের দেশিয় বাজারে আমদানীকৃত পেট্রোপণ্যের দাম বেশি। দেশিয় কোম্পানিও সেই দরই পায়। পেট্রোপণ্যের আমদানির ওপর মোটা কর চাপিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারই দেশের বাজারে উচ্চ মুনাফার রাস্তা খুলে দিয়েছে রিলায়েন্সের সামনে। ফলে ইণ্ডিয়ান অয়েল, হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম, ভারত পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি সরকারি সংস্থাকে তেল বেচবে বলে রিলায়েন্স চুক্তি করে ফেলে। কিন্তু একটা কাঁটা পথে থেকে যায়। এদেশে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে মাল বেচায় ৪ শতাংশ সেন্ট্রাল সেলস্ ট্যাক্স লাগে, যেটা যুক্ত হলে রিলায়েন্সের মালের দাম আমদানি করা মালের দামের চেয়ে বেড়ে যাবে।

এবার তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে 'শিল্পায়নে'র পুরোধা গুজরাট সরকার। সংবাদে প্রকাশ, গুজরাট সরকারের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল। এক, সেন্ট্রাল সেলস্ ট্যাক্স পুরোপুরি মকুব করা। নামে কেন্দ্রের ট্যাক্স হলেও এই ট্যাক্স আদায় করে রাজ্য সরকার। এই ট্যাক্স মালের দামের সঙ্গে যুক্ত করে ক্রেতার কাছ থেকে তোলা হয়। শিল্পপতিদের 'উৎসাহ' দেওয়ার জন্য প্রায়ই এই কর মকুব বা বিলম্বে জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। রিলায়েন্সের ক্ষেত্রেও সেলস্ ট্যাক্স মকুব করা যেত, কিন্তু তার চেয়েও তার বেশি লাভ বিলম্বে জমা দিলে। তাই মকুব না করে গুজরাট সরকার দ্বিতীয় পথটি বেছে নিয়েছে। তারা সেন্ট্রাল সেলস্ ট্যাক্স বিলম্বে জমা দেওয়ার সুযোগ রিলায়েন্সকে দিয়েছে।

পুরোপুরি মকুবের থেকে বিলম্বে জমায় লাভ কেন বেশি ? কারণ বিলম্বে জমার নিয়মটা হল — দামের সঙ্গে যুক্ত করে ট্যাক্সের টাকাটা রিলায়েন্স প্রথম ক্রেতার কাছ থেকে তুলে নেবে, তারপর ১৬ বছর পর কোন সুদ ছাড়া টাকাটা সরকারকে ফেরত দেবে। অর্থাৎ সরকারি করের টাকা বিনা সুদে ১৬ বছর ব্যবসায় খাটাবার পুরো সুযোগ রিলায়েন্স আইনত পাবে। **স্বনিযুক্তি প্রকল্পে দু-চার-দশ হাজার টাকা ঋণের সুদ আদায় করা হচ্ছে গলায় গামছা দিয়ে। না দিতে পারলে ঋণী বেকার যুবককে কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে পোরা হচ্ছে। আর সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্সের কোটি কোটি টাকা জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করে বিনা সুদে ১৬ বছর তা খাটাবার অধিকার পাচ্ছে রিলায়েন্স। এই হল পুঁজিবাদী আইনের সাম্য ও সমানাধিকারের চেহারা। এখানে সবকিছুই হচ্ছে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে।**

কিন্তু এতেও একটা কাঁটা ছিল। বিলম্বে জমার অধিকার দিলে, গুজরাট রাজ্যের মানুষের ওপর পেট্রোপণ্যে ৪% কর চাপে। পুরো ট্যাক্সটা একটা রাজ্যের উপর চাপলে সে রাজ্যে পেট্রল ডিজেলের দাম বেড়ে যাবে অস্বাভাবিক হারে। এর আগে ম্যাঙ্গালোর শোধনাগারের ক্ষেত্রে এই সুযোগ দেওয়ায় কর্ণাটকে পেট্রোপণ্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। সেই মডেল অনুসরণ করলে এক গুজরাট থেকেই বছরে ১০০০ কোটি টাকা বাড়তি আদায় করতে হবে। তাতে সরকার অপ্রিয় হবে, জনগণের ক্ষোভ বাড়বে।

কাজেই সবদিক রক্ষা করতে দুটো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক, রিলায়েন্সকে বিলম্বে জমার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। দুই, তেল কোম্পানিগুলিকে বলা হয়েছে দেশের সব রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে তেলের দামে সেস বসিয়ে ট্যাক্সের টাকাটা বেশিরভাগ তুলে নিতে। বাকিটা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকি হিসাবে। **যে কেন্দ্রীয় সরকার রেশনে ভর্তুকির প্রশ্নে বলছে 'টাকা নেই', তারাই কেন্দ্রীয় বাজেটে রিলায়েন্সকে শুধুমাত্র এই খাতে ভর্তুকি দিয়েছে ৫০০ কোটি টাকা।** বলা বাহুল্য, এ টাকাও আদায় হবে জনগণের পকেট কেটে।

সোজা কথায় 'শিল্পায়নে'র ভাঁওতা দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায়, আইনসম্মতভাবেই জনগণের ঘাড় ভেঙে ৩,৪৭২ কোটি টাকা লুঠ করে নিয়েছে একচেটিয়া রিলায়েন্স গোষ্ঠী। এহেন 'শিল্পায়ন' চলছে দেশ জুড়ে। পশ্চিমবঙ্গে চা বাগান মালিক, চটকল মালিকরা একইভাবে লুটছে। এমন ধরনের শিল্পায়নের ঢাক শুধু কংগ্রেস বা বিজেপি নয়, সি পি এমও বাজাচ্ছে। সি পি এম বলছে কেন্দ্রের নয়া আর্থিক নীতি রাজ্যের হাতে 'শিল্পায়নে'র যে সুযোগ এনে দিয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে হবে। মালিক পুঁজিপতিদের সস্তায় জল, বিদ্যুৎ, জমি তারা দিচ্ছে, শ্রমিককে বলছে আন্দোলন করা চলবে না। মালিকশ্রেণীর লুঠে তারা মদত দিচ্ছে 'শিল্পায়নে'র ধুয়ো তুলে। আজকের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের যুগে মালিকশ্রেণীর লুঠেরা চরিত্র আড়াল করে তাদের 'চাকরি সৃষ্টির নায়ক', 'বেকার যুবকের ত্রাতা', 'কর্মবীর' 'দেশপ্রেমিক' হিসাবে তুলে ধরার বুর্জোয়া প্রতারণার কোরাসে সি পি এমও গলা মিলিয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্, ১৭.১২.০৩)

মালিকশ্রেণীকে বড়দিনের উপহার ৯৬৮ কোটি টাকা

বৃহৎ মোবাইল কোম্পানিগুলিকে বড়দিনের উপহার হিসাবে ৯৬৮ কোটি টাকা কর ছাড় দিল কেন্দ্রীয় সরকার, যারা নাকি 'টাকার অভাবে' গরিবদের জন্য রেশনে চাল গম কিনতে পারছে না। লক্ষণীয়, দেশের সর্বপ্রধান বিরোধী দল তো বটেই, এমন কী সংসদীয় বামপন্থী দলগুলিও নীরব থেকে এতে কার্যত সম্মতিই দিয়েছে।

গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছিলাম, টেলিশিল্পে রিলায়েন্স ও টাটার মতো একচেটিয়া কোম্পানিকে সুবিধা করে দিতে একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর সেবাদাস বিজেপি গত ১০ নভেম্বর একীকৃত লাইসেন্স চালু করেছে। তুলনায় দুর্বল বৃহৎ টেলিকোম্পানিগুলি এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল। তারা বলেছিল সরকার শর্ত ভঙ্গ করেছে। অবশেষে ২ শতাংশ কর ছাড় দিয়ে এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সীমা ৪৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭৪ শতাংশ করে দিয়ে তাদেরও খুশি করে দিয়েছে বিজেপি। এসব কোম্পানির মধ্যে অনেকগুলিই বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে জোট বেঁধে পুঁজি ও প্রযুক্তির জোর বাড়িয়ে মুনাফা অক্ষত রাখার চেষ্টা করছে। সরকারি সিদ্ধান্ত তাদের সেই চেষ্টাটা সহজ ও আইনসঙ্গত করে দিয়েছে। বিনিময়ে কোম্পানিগুলিও সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নিয়েছে।

এর ফলাফল হল, আগামী বছর কেন্দ্রীয় সরকারের আয় আরও ৯৬৮ কোটি টাকা কমে গেল। নয়া আর্থিক নীতি ও কেন্দ্রীয় বাজেটের আলোচনায় আমাদের দল বারবার দেখিয়েছে — বাজার সঙ্কটে জর্জরিত পুঁজিপতিদের পকেট ভরে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঢালাও ছাড় ও ভরতুকি দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আয় কমিয়ে ফেলেছে। তারা মুখে বলছে বাজার অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী ব্যবসাবাণিজ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকার তার দায়িত্ব কমাবে, বাজারের ওপর এসব ছেড়ে দেবে। মুখে একথা বললেও বাস্তবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, জ্বালানি ইত্যাদি গরিব ও মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে রাখার দায়িত্ব সরকার ছেড়ে দিচ্ছে, কাঁধে তুলে নিচ্ছে সরকারি তহবিলের টাকা ঢেলে মালিকশ্রেণীর পকেট ভরে দেওয়ার দায়িত্ব। অর্থনীতির প্রায় সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, বিপণন, পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকার বেপরোয়াভাবেই হস্তক্ষেপ করছে, তবে তা জনস্বার্থে নয়, মালিকশ্রেণীর স্বার্থে। (সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ২৫.১২.০৩)

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

তিনের পাতার পর

২০০৩'-এর ফলে ক্যাপটিভ উৎপাদনকারী বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থাগুলি সব থেকে কম দামে বিদ্যুৎ পাবে। অপরদিকে সাধারণের জন্য দাম বাড়বে ৫০ শতাংশ। অভিন্ন মাশুল চালু হলে এইসব গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, বস্তিবাসী, আদিবাসী, কৃষক, ক্ষুদ্র বাণিজ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম আরো কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। যে গ্রাহকরা বর্তমানে বিদ্যুৎ কেনে ১৭৩ পয়সা প্রতি ইউনিট হিসাবে, তখন তার দাম দাঁড়াবে ৬২২ পয়সা প্রতি ইউনিট। মূল প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে, প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে মাশুল কমানোর যে রঙিন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সেটা যে মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়, তার প্রমাণ সি ই এস সি এই প্রতিযোগিতার কথা বলে ইতিমধ্যে ৪৩৭২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশনের কাছে বিদ্যুৎ পর্ষদও একই প্রস্তাব দিয়েছে।

এই সম্মেলন মনে করে, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ কার্যকর হলে গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলার পরিবর্তে অন্ধকার নেমে আসবে। বন্ধ হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র শিল্প। বেকার সংখ্যা বেড়ে যাবে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষী জমি বিক্রি করতে বাধ্য হবে। সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে।

এই সম্মেলন মনে করে, রাজ্য সরকার এই সর্বনাশা বিদ্যুৎ আইন প্রতিরোধের কোনও চেষ্টা না করে একদিকে তাকে দ্রুত কার্যকর করার চেষ্টা করছে, অপরদিকে রাজ্যের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে গদি দখলে রাখার জন্য নিজেদের বর্তমান আইনের বিরোধী বলে মিথ্যা প্রচার করছে। এই সম্মেলন রাজ্য সরকারের এই নির্মম, ধূর্ত রাজনীতির তীব্র নিন্দা করছে।

গ্রাহক সম্মেলন মনে করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও 'বিদ্যুৎ আইন ২০০৩'-এর ১৮০, ১৮২ নং ধারা এবং ১০৮ ও ১৭২ নং ধারা প্রয়োগ করে এই সর্বনাশা আইনকে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ বন্ধ রাখতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে পথে না গিয়ে একদিকে ভরতুকি বন্ধ, অপরদিকে দ্রুত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে ভেঙে চারটি কোম্পানিতে পরিণত করে এই সর্বনাশা আইনকে কার্যকর করছে।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয় এ কথা প্রমাণ করছে যে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়ে মিলিতভাবে এত বড় ভয়াবহ জনস্বার্থ বিরোধী নীতিকে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। সেই কারণে দলমত নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যুৎ গ্রাহককে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাবে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সম্মেলন থেকে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে ১০ লক্ষ নাগরিকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আগামী ২২ জানুয়ারি '০৪ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুনরায় বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হলে সি ই এস সি ভবন ও বিদ্যুৎ পর্ষদ ভবন ঘেরাও করা, প্রয়োজনে বৃহত্তর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ভবেশ গাঙ্গুলিকে সভাপতি এবং সঞ্জিত বিশ্বাসকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত করে ১২২ জনের একটি শক্তিশালী সারা বাংলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্গাপুরে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির দুর্গাপুর শাখার পক্ষ থেকে ৯ ডিসেম্বর শিল্পগ্রাহকদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জ আদায়ের বিরুদ্ধে এবং বিদ্যুতের উপর সেস বসানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেনাচিতি বিদ্যুৎ অফিসে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন দুর্গাপুর শাখার সহ-সভাপতি মানবেন্দ্র মণ্ডল ও সম্পাদিকা সুচেতা কুণ্ডু। এই কর্মসূচিতে সমিতির বর্ধমান জেলা সম্পাদক অশোক দাঁ উপস্থিত ছিলেন। এস এস-এর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

চা বাগানে মৃত্যুপ্রবাহ

একের পাতার পর

চিকবরাইকরা এখন কী খাচ্ছেন ? ভাতের বদলে তাঁদের খাবার এখন চা-ফুল সেদ্ধ। মাঝে মধ্যে জোটে ওলের মত কান্দা, যা চা বাগানে হয়। সেই কান্দা সংগ্রহে আজ শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধছে। এক টুকরো কান্দা পেলে সেদিন যেন বাড়িতে ধুম লাগে। কীভাবে খাওয়া হয় চা-ফুল বা কান্দা ? গাঙ্গি চিকবরাইক বলেন, চা-ফুল বা কান্দা দুটোই সেদ্ধ করি, তবে কান্দা একবারে সেদ্ধ হয় না। কয়েকবার সেদ্ধ করে লবণ মিশিয়ে তারপর খাওয়া হয়। চা-ফুল খেয়ে একের পর এক শিশু এবং বড়রা অসুস্থ হচ্ছে জেনেও তাদের খাবার এখন চা-ফুল আর কান্দা। বাগানের শ্রমিকরা এইভাবে অখাদ্য কুখাদ্য বিষ খাবার খাচ্ছে। শ্রমমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন, 'খেয়েই মরছে, না খেয়ে মরেনি'। মানুষের মৃত্যু নিয়ে কী নির্মম পরিহাস !

এই অবস্থায় একটা সরকারের কি কিছুই করণীয় নেই ? কোনও দায় নেই ? যদি না থাকে এই অচলায়তন সরকার শ্রমিকের কী কাজে লাগে ? অথচ এই শত শত মৃত্যুর ঘটনায়ও ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কী করতে পারত রাজ্য সরকার এই মুহূর্তে ? পারত বিনামূল্যে শ্রমিকদের মধ্যে রেশন সরবরাহ করতে, পারত কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প চালু করতে, পারত ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করে বাগান খুলতে, পারত শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া পাওনা, পি এফের টাকা মিটিয়ে দিতে মালিকপক্ষকে বাধ্য করতে। সরকার তার আইনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু করেনি। বামফ্রন্ট সরকারের এই নীরবতা, এই নিষ্ক্রিয়তা মালিকশ্রেণীরই স্বার্থে। মুখ্যমন্ত্রী মালিকদের ডাকা সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় পান, কিন্তু চা বাগানের সমস্যা নিয়ে আলোচনার তাঁর সময় নেই।

অন্যদিকে সরাসরি শ্রমিক স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মালিকদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন। গত ৬ ডিসেম্বর তোর্ষা চা বাগান খোলার চুক্তি হয় ৪০০ জন শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নিয়ে। বীরপাড়াতে আই টি পি এ-র ডুয়ার্স শাখার দপ্তরে সিটু, আই এন টি ইউ সি এবং ইউ টি ইউ সি (বউবাজার) প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনের নেতারা মালিকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন কংগ্রেসের ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স-এর জয়দেব রায়, সুদর্শন শর্মা, আর এস পি-র ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমল দর্জি, সিপিএম-এর চা-বাগান মজদুর ইউনিয়নের আর ছেত্রী, ললিত, বাগিচা ম্যানেজার এস এন ইমন, আই টি পি এ'র সঞ্জয় বাগচি প্রমুখ। চুক্তিতে বলা হয়েছে, ৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ৪০০ জনের কর্মচ্যুতির চুক্তির শর্তানুযায়ী ৫০ জন শ্রমিকের নাম এখনই দিতে হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আরও ১০০ জন শ্রমিকের নাম ইউনিয়ন নেতারা মালিকপক্ষের হাতে জমা দেবেন। এই হল কংগ্রেস, সি পি এম, আর এস পি প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে যাদের লড়ার কথা তারা আজ লিস্ট করে করে মালিকদের হাড়িকাঠে শ্রমিকদের বলি দিচ্ছে। এই চুক্তিই প্রথম নয়, গত বছর কিছু চা বাগানে এই সমস্ত অতিকায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ৬ দিন কাজ করিয়ে ৩ দিনের বেতন অর্থাৎ অর্ধবেতনে কাজ করার শর্ত মেনে নিয়ে বাগান খোলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এই সমস্ত পদক্ষেপের খবর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব বা মূল পার্টির নেতৃত্ব জানেন না তা হতে পারে না। বরং তাদের অদৃশ্য সংকেত না থাকলে এসব কালাচুক্তি হতেই পারত না। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন মালিকপক্ষ এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে, পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে দিয়েই মালিকরা শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমিত করে। সাধারণ শ্রমিকরা যদি পর্দার আড়ালে চলমান এই খেলা ধরতে না পারেন, প্রশ্ন তুলতে না পারেন, তাকে রুখতে না পারেন, তাহলে নির্মম মালিকী শোষণ থেকে তাঁদের বাঁচার কোন আশা নেই।

আজ বাগানে সংকট তীব্র বলে যে ব্যাপক প্রচার চলছে, তা কি সত্যিই বাস্তব ? মালিকপক্ষ থেকে তোলা এই সংকটের ধুয়ো — আসলে গভীর ষড়যন্ত্রেরই ধুম্রজাল। উত্তরবঙ্গের ২০/২৫টি চা-বাগান যে আজ বন্ধ, তা শ্রমিক অসন্তোষের জন্য নয়, মালিকই বন্ধ করে দিয়েছে। মালিকপক্ষের যুক্তি হল — বাগানে লোকসান হচ্ছে, ফলে এত শ্রমিক নিয়ে কাজ করানো আর সম্ভব নয়। শ্রমিকদের আর রেশন, কম্বল, কাঠ, বিদ্যুৎ এসব দেওয়া সম্ভব নয়। বোনাস দেওয়াও সম্ভব নয়। হয় এসব মেনে কাজ কর, নতুবা লক আউট। এই অজুহাত তুলেই চা-বাগান মালিকরা আচমকা বাগান বন্ধ করে দেয়।

কিন্তু মালিকপক্ষের এই যুক্তির কতটুকু সারবত্তা আছে ? প্রথমত, যদি চা বাগানে সত্যিই লোকসান হয় তাহলে একের পর এক নতুন চা বাগান গড়ে উঠছে কীভাবে ? উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ৩০ থেকে ৪০ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে চা বাগিচা গড়ে উঠল, দার্জিলিংয়ের সমতলে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার হেক্টর, জলপাইগুড়িতে ১৫ থেকে ২০ হাজার হেক্টর এবং কোচবিহারে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে চা বাগিচা গড়ে উঠল। ১৫০টি আনারসের বাগান চা বাগানে রূপান্তরিত হল। যদি মুনাফাই না থাকে এই বাগিচাগুলি কি হওয়ার কথা ?

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে চায়ের বাজার নেই। একথাও ঠিক নয়। পৃথিবীতে এবং ভারতবর্ষে কোথাও চায়ের চাহিদা কমেনি। FAO রিপোর্ট দেখাচ্ছে পৃথিবীব্যাপী চায়ের চাহিদা বছরে ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। এস এম জৈন অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্যে চা পান করার প্রবণতা বাৎসরিক প্রায় ৮ শতাংশ হারে বেড়েছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ। চায়ের দামও কমেনি। খোলা বাজারে চায়ের দাম যথারীতি ঊর্ধ্বমুখী।

তৃতীয়ত, বলা হচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের বেশি মজুরি দেওয়া হয়। এটাও ডাহা মিথ্যা। ILO রিপোর্ট দেখাচ্ছে, উত্তরবঙ্গ থেকে কেরালা বা শ্রীলঙ্কায় চা শ্রমিকদের মজুরি অনেক বেশি। তাহলে কেরালায় চা শিল্পে সংকট এমন স্তরে নেই, নেই শ্রীলঙ্কায় — যত সংকট শুধু উত্তরবঙ্গেই ? তাও আবার উত্তরবঙ্গের ২০/২৫টি বাগানেই শুধু কেন ? সংকট বাদবাকী ২৭০টি বাগানে সংক্রামিত হল না কেন ?

ফলে একথা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, চা বাগানের এই সংকট খুব পরিকল্পনামাফিক প্রচার করে করে হঠাৎ একটা বিশেষ সময়ের জন্য বাগান বন্ধ করার পরিবেশ সৃষ্টির গভীর ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। কোন্ সময়ে বাগান বন্ধ করা হয় ? সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত বাগান বন্ধ থাকে। কারণ ঐ সময় পাতা তোলা হয় না। ঐ সময়ে বাগানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হওয়ার কথা। এই সময় বাগান ছেড়ে মালিক পক্ষ চলে যায়। রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন সে মনে করে না। বাগান থেকে তোলা লাভ সে অন্যত্র বিনিয়োগ করে। বাগানকে রক্ষণাবেক্ষণ না করে রুগ্ন এবং জরাগ্রস্ত করে তোলে মালিক। আর রুগ্ন বাগান দেখিয়ে সে একদিকে কর ফাঁকি দেয় এবং অন্যদিকে সরকারি লাখ লাখ টাকা অনুদান হিসাবে হাতিয়ে নেয়।

মুনাফার অঙ্ক সে এভাবেই শুধু বাড়ায় না, বাগানকে রুগ্ন দেখিয়ে, লোকসানের অজুহাত তুলে শ্রমিকদের কম বেতন নিতে বাধ্য করে, অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে নেয়, শ্রমিক ছাঁটাই করে, বোনাস-রেশন-বিদ্যুৎ-চিকিৎসার সুযোগ সহ অন্যান্য পাওনা থেকে শ্রমিককে বঞ্চিত করে। বাগানে এই ষড়যন্ত্র চলছে।

এই আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার পরিবর্তে ক্ষমতাসীন দলগুলির শ্রমিক সংগঠনগুলি মালিকদের দেওয়া কালা প্রস্তাবগুলি মেনে নিচ্ছে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষর করে শ্রমিকদের তীব্র শোষণের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। শত শত শ্রমিকের মৃত্যু, আত্মহত্যা, কোনকিছুই এদের পাষাণ হৃদয়কে টলায় না। কারণ সংগঠনের নেতৃত্ব মালিকদের টাকার থলির কাছে বিক্রীত।

কিন্তু শ্রমিকের বাঁচার লড়াই থেমে থাকতে পারে না। বাগানে এই মৃত্যুর প্রবাহ বন্ধ করার জন্য এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মানতে

আটের পাতায় দেখুন

আলিপুরদুয়ারে চা-শ্রমিকদের বিক্ষোভ মিছিল

গত ১০ই ডিসেম্বর, শিলিগুড়িতে আইন অমান্য আন্দোলনের পর এবার আঞ্চলিক স্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছে চা-শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এই কর্মসূচি অনুযায়ী গত ২২ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ারে চা-শ্রমিকদের বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে এস-ডি-ও অফিসে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন পার্শ্ববর্তী ২৫টি চা-বাগানের শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষে কমরেড গোবিন্দ ঝাঁ, কমরেড তপন সিং, কমরেড কমল ওঁরাও, কমরেড সুশীলা ওঁরাও, কমরেড আশা টোপ্পো, কমরেড দেবাশীষ শর্মা প্রমুখ। বিক্ষোভ সমাবেশে 'এনবিটিপিইউ'-এর (NBTPEU) সহ সাধারণ সম্পাদক কমরেড অভিজিৎ রায় বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চরম উদাসীনতা এবং মালিকী আক্রমণের প্রতিবাদে তাঁরা লাগাতার আন্দোলনের পথে আছেন। এরপর জলপাইগুড়িসহ ডুয়ার্সের অপর দুটি জনপদ বীরপাড়া এবং মালবাজারে আঞ্চলিক বিক্ষোভ সংগঠিত করা হবে। সরকার এবং মালিকপক্ষ এতেও কর্ণপাত না করলে রাস্তা অবরোধ থেকে কলকাতায় মহাকরণ অভিযানের ডাক দেওয়া হবে। সমাবেশে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন চা-শ্রমিক সংগঠক কমরেড রাজকলিয়া রায়, কমরেড রাজেশ লোহার, কমরেড রীণা সিং, কমরেড আশা টোপ্পো, কমরেড সুখেন মুন্ডা, কমরেড সুশীলা ওঁরাও, কমরেড ভগবান দাস টোপ্পো প্রমুখ। বিক্ষোভ-সমাবেশে বক্তব্য শোনার জন্য এস-ডি-ও অফিস, আদালত চত্বর থেকে বহু কর্মচারী, সাধারণ মানুষ ও দোকানদাররা বেরিয়ে আসেন এবং সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

কালচিনিতে সাইকেল মিছিল

গত ৭ ডিসেম্বর চা-শ্রমিক পরিবারের মহিলা-শ্রমিক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক বিশাল সাইকেল মিছিল ডুয়ার্সের কালচিনি শহরের আশপাশের বাগানগুলিতে দাবি-প্ল্যাকার্ড নিয়ে পরিক্রমা করে। এই মিছিল থেকে ডাক দেওয়া হয় — শুধু বৈঠক আর কমিশন করে নয়, আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মালিকী চক্রান্ত এবং সরকারি উদাসীনতার জবাব দিতে হবে।

SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

গণদাবী ২ জানুয়ারি, ২০০৪ ৫৬ বর্ষ / ২০ সংখ্যা

মালিকদের বেলায় আইন কোথায়?

চা বাগানের জমি সরকারের। চা বাগান চালানোর জন্যই মালিকদের এ জমি লীজ দেওয়া হয়েছে। অথচ বাগান বন্ধ রেখে দিয়ে তারা এ সম্পত্তির অনুচিত ব্যবহার করছে। তবু মালিকদের বিরুদ্ধে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। শরীরের রক্ত জল করে যারা দেশের সম্পদ তৈরি করছে সেই শ্রমিকদের বাঁচাতে কিন্তু আইনের কোন ভূমিকাই দেখা যাচ্ছে না।

চা বাগানের নাম করে মালিকরা কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিচ্ছে। টী বোর্ড থেকে নূতন গাছ রোপনের জন্যও তারা টাকা নিচ্ছে। কিন্তু এসব টাকা ঠিকমত কাজে না লাগিয়ে গায়েব করে দিচ্ছে, ব্যাঙ্কের টাকা লুটে নিয়ে বাগান বন্ধ করে দিচ্ছে। বাগানের উন্নতির অজুহাত দেখিয়ে আবার ঋণ নিচ্ছে। আবার গায়েব করে দিচ্ছে। সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে। বেকার যুবক ঋণ শোধ করতে না পারলে তাদের ঘরবাড়ি ক্রোক করার নোটিশ পাঠানো হয়। কারণ আইন নাকি নিজের রাস্তায় চলে। মালিকদের বেলা আইন কিন্তু অন্য রাস্তায় চলে।

আইন অনুযায়ীই লক আউট করলেও বাগানে পানীয় জলের সরবরাহ, হাসপাতাল পরিষেবা চালু রাখার কথা। মালিকরা তা করে না। দূষিত জল খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মরে। কিন্তু এখানে আইন অন্ধ। সরকার দেখেও দেখে না। শ্রমিকদের পি এফ-এর কোটি কোটি টাকা মালিকরা মেরে দিয়েছে। এল আই সি, গ্র্যাচুইটির টাকা পর্যন্ত মেরে দিয়েছে। তাদের কিন্তু শাস্তি হয় না। ফ্যাক্টরি থেকে একমুঠো চা নিয়ে গেলে চার্জশিট, সাসপেন্ড, এনকোয়ারি, থার্টিন জি, কত আইন কত কানুন। এক মুঠো চা পাতির জন্য সাজা ভুগতে হয় মাসের পর মাস। কিন্তু মালিকরা কোটি কোটি টাকা চুরি করলেও আইনের রক্ষকদের দেখা মেলে না কেন?

মিথ্যা অজুহাতে বাগান বন্ধ রেখে শত শত মানুষকে ভাতে মারছে মালিক। এই মালিক কি হত্যাকারী নয়? এই গণহত্যার বেলা সরকার কী করে? আইন কোথায় থাকে?

বাগানের গুদামে কি চা জমে আছে? ওয়্যারহাউসে কি চা পচছে? চালানের পর চালান যাচ্ছে। ওয়্যারহাউসেও চা আসতে আসতেই শেষ। দোকানেও তাই। তাহলে কোথায় বাজার সঙ্কট? খোলা বাজারে ১০০ টাকা/১২০ টাকার নিচে চা নেই। তাহলে লোকসান কিসের? সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে, কেবল অকশনেই (নিলামে) দাম ওঠে না — এটা কী করে সম্ভব? অকশন বাজারে কিসের ভেল্কি চলে? শোনা যায় ব্রোকারদের সাথে মালিকদের সাঁট-গাটের কথাও। এর তদন্ত হয় না কেন? আবার অকশনে চা না পাঠিয়ে প্রাইভেট সেল করে মালিক। কত করে, কি দামে করে — হিসেব নেই। অকশন বাজারে সব চা পাঠাতে মালিকদের বাধ্য করতে পারে না সরকার। অকশন বাজারে স্বচ্ছতা আনার জন্য, কালাধান্ধা বন্ধ করার ক্ষমতা আইনের নেই।

মালিক বলে, লোকসান। তাই ছয় দিনের কাজ করে তিনদিনের হাজিরা নাও। শ্রমিক ছাঁটাই মেনে নাও। মন্ত্রী-আমলারাও তাই বলে। ইউনিয়নের বাবুরাও তাতে সুর মেলায়। ভয় দেখায়, আন্দোলন করো না, বাগান বন্ধ হয়ে যাবে, মালিকের জুলুম মেনে নাও। সরকার হিসেব করে, মালিকদের কিভাবে কত সুবিধা দেওয়া যায়। নতুন নতুন আইন বানায় শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য, মিছিল-মিটিং-হরতাল বন্ধ করার জন্য। শ্রমিকদের পাওনা থেকে বঞ্চিত করার জন্য, ছাঁটাই করার সুবিধার জন্য আসছে নতুন নতুন সব কালা কানুন। তাই ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির রাজপথে শ্রমিকরা আওয়াজ তুলেছিল — এ আইন আমরা মানি না। যে আইন শ্রমিককে মারে, যে আইন মালিকের স্বার্থ রক্ষা করে সে আইন আমরা ভাঙব, আইন ভেঙে জেলে যাব। আওয়াজ উঠেছিল, 'কানুন তোড়ো জেল ভরো।' এ ছিল এক নূতন পর্যায়ের আন্দোলন। এ ছিল দালাল সরকার, প্রশাসনের সাথে সরাসরি সংঘাতের কর্মসূচী। দীর্ঘদিন ধরে মিছিল, মিটিং, ডেপুটেশন, ধর্না, অনশন, ধর্মঘট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে টিপিইউ এবং এস ইউ সি আই গড়ে তুলেছিল এর প্রস্তুতি।

আন্দোলনের নামে বড় বড় নেতাদের গড়াপেটা খেলা, বোঝাপড়ার নাটক শ্রমিকরা অনেক দেখেছে। নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি শ্রমিকরা অনেক শুনেছে, বড় বড় নামী নামী নেতাদের ওপর ভরসা করে তারা অনেক বার ঠকেছে। আর নয়। সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বকে চিনে নিয়ে, সঠিক লাইনের ভিত্তিতে, নিজেদের ঐক্য ও সংগঠনের শক্তিতে, নিজেদেরই আদায় করে নিতে হবে বাঁচার অধিকার। তার জন্য আত্মবিশ্বাস আর সাহসের সাথে সচেতন শ্রমিকের মর্যাদাবোধ নিয়ে তারা সামিল হয়েছিলেন লড়াই-এর ময়দানে। মরতেই যদি হয় কুকুর বেড়ালের মত মরব না। মরব লড়াই করে, মাথা উঁচু করে মরব। গাড়ি-বাড়িওয়ালা ভণ্ড নেতাদের কাছে ভিখারির মত চাইতে যাব না। লড়াই করে আদায় করে নেব রুজি-রুটির অধিকার। এই সঙ্কল্প নিয়েই তাঁরা সেদিন 'কানুন তোড়ো' আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সচেতন শ্রমিকের এই দৃঢ় সঙ্কল্প, সঠিক নীতি ও আদর্শ ভিত্তিক এই আন্দোলনকেই মালিকরা ভয় পায়, প্রশাসন ভয় পায়। মালিকরা জানে, গরম গরম ভাষণ দেনেওয়ালা নেতারা, টিভি-খবরের কাগজে যাদের সর্দি-কাশির খবরও ছাপা হয় তারা আসলে কাগুজে বাঘ। তারা মালিকদেরই কেনা গোলাম। কিন্তু সচেতন শ্রমিকের সঠিক দিশার আন্দোলন তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। তাই লাঠি-গুলি চালিয়ে এই আন্দোলনকে দমন করে সরকার মালিকদের শান্তি বজায় রাখতে চায়।

কিন্তু তারা ভুল করে — অত্যাচার চালিয়ে, গুলি করে হত্যা করেও এই আন্দোলনকে দমন করা যায় না। এই আন্দোলন চলবে। আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েই ১০ ডিসেম্বর শ্রমিকরা ঘরে ফিরেছে। চলছে তারই প্রস্তুতি। বাগানে বাগানে আওয়াজ উঠেছে — 'লড়াই হো তো অ্যায়সা।'

চা বাগানে মৃত্যুপ্রবাহ

সাতের পাতার পর

সরকারকে বাধ্য করার জন্য তীব্র জঙ্গি আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই আন্দোলনের সূচনা করেছে। ১০ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে কয়েক হাজার মানুষ বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে আইন অমান্য আন্দোলন করে। আরও ধারাবাহিক আন্দোলন নেতৃত্বের তরফে ঘোষণা করা হয়।

(তথ্যসূত্র ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৫-৭-০৩, ৭-১২-০৩ এবং অন্যচোখে, শারদসংখ্যা ২০০৩-এ প্রকাশিত ডাঃ মানস দাশগুপ্তের প্রবন্ধ)

ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

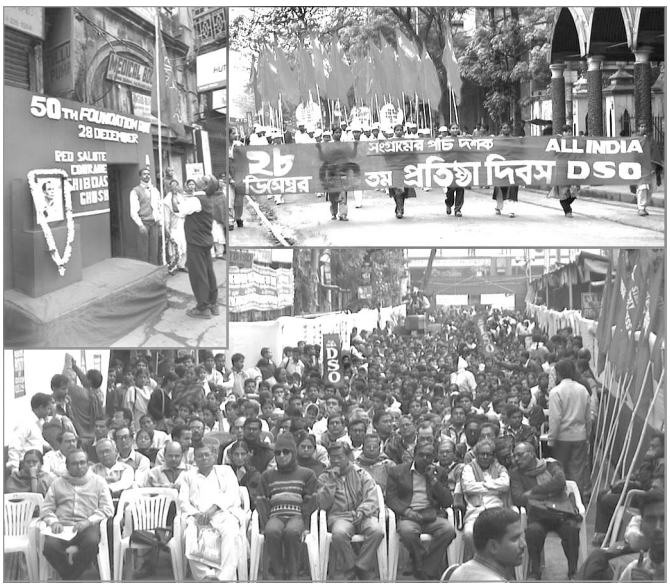

২৮ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হল মিছিল ও সভার মধ্য দিয়ে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা করলেন তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই ৫০ বর্ষ পূর্তির বছরটি উদ্‌যাপন করা হবে। এদিন ১টার সময় শহীদ মিনার ময়দান থেকে সংগঠনের ৫০টি পতাকাবাহী স্বেচ্ছাসেবককে সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য মিছিল কলেজ স্কোয়ারের মহাবোধি সোসাইটি হলের সামনে সভায় যোগ দেয়। পথে ডি এস ও'র কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণীর সামনে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের প্রথম কলকাতা জেলা সম্পাদক বর্তমানে এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড রণজিৎ ধর। কলেজ স্ট্রীটের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক পর্বের সংগঠক বর্তমানে এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল ও বর্তমানে আইনজীবী আন্দোলনের নেতা কমরেড ভবেশ গাঙ্গুলী। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাপর্বের নেতা, বর্তমানে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। (বিস্তৃত সংবাদ আগামী সংখ্যায়)

অভিযুক্ত রাজনৈতিক কর্মীর পরিবারের উপর নির্যাতন গর্হিত অপরাধ

মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া জনযুদ্ধের মহিলা কর্মীর চিঠি প্রসঙ্গে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন —

"কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে এবং তা প্রমাণিত হলে সরকার আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে, কিন্তু তার বাবা-মা বা পরিজনদের কোনমতেই ধরতে বা অত্যাচার করতে পারে না। এই কাজ শুধু বেআইনি নয় — অন্যায় ও গর্হিত অপরাধ। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।"

সরকার পারে, কিন্তু করবে না

"উত্তরবঙ্গে বন্ধ চা-বাগানের মালিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক এ সুব্বাইয়া। রাজ্য সরকার অবশ্য এখনই সেই রাস্তায় হাঁটতে নারাজ।...

জেলাশাসক সম্প্রতি প্রস্তাব দিয়েছেন,

* যেসব চা-বাগান মালিক বাগান খোলার ব্যাপারে অনীহা দেখাচ্ছেন, সেইসব বাগান খোলার দায়িত্ব সাময়িকভাবে যৌথ পরিচালন কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হোক।
* বাগান চালু করতে অনাগ্রহী বাগান মালিকদের লিজ খারিজ করা হোক। পরিবর্তে চালাতে ইচ্ছুক কাউকে স্বল্প মেয়াদি লিজে চালানোর অনুমতি দিক সরকার।
* ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নেওয়া ঋণের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢিলেমি করছে যেসব চা-বাগান মালিক, ঋণদাতা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের বিরুদ্ধে ঋণ আইনে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। তবে চা-বাগান ধরে ধরে সেগুলি খুলতে আলোচনা শুরু করার জন্যও রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছেন জেলাশাসক।" (বর্তমান ২৬-১২-০৩)

শিল্পবাণিজ্য সচিব সব্যসাচী সেনকে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিটির রিপোর্টের পরই রাজ্য সরকার নিজেদের অবস্থান জানাবে বলে সংবাদে প্রকাশ।

'কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে অনিচ্ছুক হলে কমিটি গঠন করে ঝুলিয়ে দাও' — বিজনেস ম্যানেজমেন্টের চালু প্রবাদ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net